

Vol. 53 | No. 2 | 2016

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

গীতাঞ্জলি কাব্যের অধ্যাত্মবোধ : পরিপ্রেক্ষিত ও স্বরূপ

Volume	53
Issue	2
Year	2016
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মো. সোহেল রানা
Published online	February 1, 2016
DOI	10.62328/sp.v53i2.10
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v53i2.10
Pages	১৪৯-১৬২
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

গীতাঞ্জলি কাব্যের অধ্যাত্মবোধ : পরিপ্রেক্ষিত ও স্বরূপ

মো. সোহেল রানা*

সার-সংক্ষেপ: *গীতাঞ্জলি* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কিংবা প্রধান বা প্রিয় কাব্যের কোনোটিই নয়। এমনকি কোনো গবেষক-সমালোচক তা দাবিও করেননি। কিন্তু এই কাব্যের জন্যই তিনি পান নোবেল পুরস্কার। *গীতাঞ্জলি* কাব্যই কবিকে প্রতিষ্ঠিত করে বিশ্বকবিরূপে। ইউরোপের মানবতন্ত্রী ও বিজ্ঞানতন্ত্রী সভ্যতার নিচের তলায় ছিল কুটিল ক্ষয় আর উপরতলায় ছিল কুৎসিত স্বার্থপরতা এবং শূন্যতা। এমন সময়ে অপেক্ষাকৃত সরল অথচ গভীর সংস্কৃতির মর্মস্পর্শী বাণী রবীন্দ্রনাথ উপস্থাপন করলেন তাঁর *গীতাঞ্জলি* কাব্যে। *গীতাঞ্জলি*তে এক ভাবের ঘোর কবিকে পেয়ে বসেছিল, সেই ভাবের ঘোরেই কবি নির্মাণ করেছিলেন *গীতাঞ্জলি*র 'নবজীবন'। কবির সেই 'নবজীবনে'র স্বরূপ সন্ধান-ই এই রচনার অভিপ্রায়।

শিল্প হলো শিল্পীর বিমূর্তবোধের বৈশ্বিক প্রকাশ। বিমূর্তবোধকে মূর্ততায় রূপায়ণের জন্য শিল্পী মায়াকে আশ্রয় করেন। শিল্পী মায়াকে দেখেন একের ভেতরে/মধ্যে বিচিত্র ছন্দের দোলারূপে। শিল্পীকে তাই আত্মপ্রকাশ ও আত্মবিকাশের নিমিত্তেই করতে হয় অদ্বৈতের পরম সাধনা। আর 'ব্যক্তিজীবনে, চিন্তাশীলসত্তায়, দার্শনিক চিন্তনে প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সৌন্দর্য-আনন্দ-প্রশান্তি-কল্যাণ সন্ধানে নিরলস (বেগম আকতার, ২০১১ : ৩)। রবীন্দ্রনাথ তাঁর চেতনা ও ভাবাদর্শকে রূপ থেকে রূপান্তরে নিয়ে বিশ্বমানব তৈরি করতে চেয়েছেন। কিন্তু তা গড়পড়তা নয়; প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার পরিসর বাড়িয়ে, সংসারের প্রান্তসীমা পেরিয়ে অসীমের দিকে উত্তরণের কথা বলেছেন। তিনি বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণ একটি সত্তাকে অন্তর্দৃষ্টিতে দেখার প্রয়াস পান। এবং সে পূর্ণতা বস্তুর নয়; আত্মার, চৈতন্যের। ঔপনিবেশিক প্রভুত্ববাদ থেকে তৎকালীন বাঙালি সমাজের বদ্ধ জীবনভাবনা, হীনস্বার্থবুদ্ধি থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন ছিল একটি অধিবাস্তব *(Super-realistic)* জগৎ গড়ার যা হবে সৌন্দর্যে ও মঙ্গলবোধে পরিস্নাত। দৈশিক ও বৈশ্বিক অস্থিরতা, পরিবারের স্বজনদের মৃত্যুশোক, কবির শারীরিক অসুস্থতা, জমিদারিতে গোলযোগ প্রভৃতি ঘটনা কবিকে অন্তর্মুখী করে। তিনি অধ্যাত্মজগতের বাসিন্দা হয়ে অমৃতলোকের সঙ্গে মর্ত্যলোকের সেতু রচনায় ব্রতী হলেন। এই সেতুই

*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

হলো *গীতাঞ্জলি* পর্বের রচনার মূল ভাবকল্প। তাই *গীতাঞ্জলি* কবির শ্রেষ্ঠসৃষ্টি কিংবা প্রধান কাব্য না হওয়া সত্ত্বেও কবিকে এনে দেয় বিশ্ব সম্মান।

তবে রবীন্দ্রনাথের এই অধ্যাত্মচেতনা ছিল দেশ-কাল নিবিষ্ট, সৌন্দর্যে মঙ্গলবোধে পরিস্নাত। কেননা রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে 'জগৎ জীবনোপলব্ধির সুবিশাল পরিধি কেন্দ্রে চলমানতা-সমগ্রতাবোধ-বিশ্বাভূতি-সর্বাস্তিবাদী ধর্মবোধ ও মানবতাবাদকে সৃষ্টিশীল নান্দনিক ঐক্যশক্তিতে সমন্বিত করতে পেরেছিলেন (সৈয়দ আকরম, ২০০১ : ৩১)। তাই রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মচেতনা একান্তই তাঁর স্বকীয়, স্বতন্ত্র – বলা যেতে পারে 'রাবীন্দ্রিক'।

অধ্যাত্মবাদ বা অধ্যাত্মচেতনা হলো মানবের দেহের বা বস্তুর বা সীমার বাইরে কল্পিত সত্তা। সীমার বা বস্তুর বাইরে গিয়ে অসীমের মধ্যে যে সত্তা বিরাজমান তাই অধ্যাত্ম। অধ্যাত্ম হলো—'আত্মবিষয়ক [অধ্যাত্মদৃষ্টি, অধ্যাত্মলোক] ব্রহ্মবিষয়ক, চিত্তসম্বন্ধীয়। অর্থাৎ অধি+আত্মন+অ=অধ্যাত্ম। আর তত্ত্বগত অর্থে আত্মবিদ্যার বা ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান। ব্রহ্ম বা পরমাত্মাই সকল কিছুর মূল এই মতবাদই হল অধ্যাত্মবাদ (শৈলেন্দ্র, ১৯৯৫ : ১৬)। আমার যাবতীয় জ্ঞানই জ্ঞাতার আত্মগত। এই মত *Subjectivism;* এই মতবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তিই হলেন অধ্যাত্মবাদী। অন্তরাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যোগ সাধনাই হলো অধ্যাত্মের পথ। আত্মার সন্ধানই অধ্যাত্মবাদের মূলকথা; চৈতন্যময় সত্তার অস্তিত্ব সন্ধান করা। যিনি আত্মার বা চৈতন্যের সন্ধানরত তিনিই আধ্যাত্মিক। আধ্যাত্মিক হলো আত্মা সম্বন্ধীয়; আত্মিক চিন্তা বা সাধনা। অতীন্দ্রিয় সাধনাই হলো অধ্যাত্ম। তবে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সত্তায়, ঐতিহ্যে ও স্বকীয়তায় বিরাজমান ছিল আত্মার সন্ধান, চৈতন্যের সাধনা। এই অর্থে রবীন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিক। তবে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মচেতনা একান্তই রাবীন্দ্রিক, ঐতিহ্যিক, স্বভাবজাত ও পরম্পরিত।

অধ্যাত্মচেতনা ও ধর্মচেতনা কথা দুটি সমার্থক নয় তবে একটা গভীর সামঞ্জস্য আছে। দুই-এর মাঝে ধর্মে কোনো সম্প্রদায়ের ছাপ থাকতে পারে কিন্তু অধ্যাত্মচেতনায় সে ভাবনার উপরেও থাকে নিজস্ব উপলব্ধি। 'বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, বৈষ্ণব ধর্ম, শক্তি, মধ্যযুগের সাধক বাউল, সুফি ও ক্রমে রামমোহন, বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর, সাধক রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দসহ আধুনিক যুগের সাধক কবিদের প্রভাবেই রবীন্দ্রনাথের স্বতন্ত্র অধ্যাত্মদর্শন গড়ে উঠেছে (এষা, ২০০৯ : ১১২)। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেটাকে প্রকৃত ধর্ম মনে করতেন না। কোনো মানুষের যা চরিত্র এবং জীবনাদর্শ, যা তাঁর ব্যক্তিত্বের ভেতর থেকে উদ্ভিন্ন হয়ে ওঠে তা-ই তাঁর যথার্থ ধর্ম। রবীন্দ্রনাথের ধারণা সকল মানুষের মধ্যে 'আমার ধর্ম' বলে একটি জিনিস আছে যা সে স্পষ্ট করে জানে না। যার সম্পর্কে সে সচেতন নয়। ধর্মের নানা নামের [হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান-ইসলাম] অন্তরালে তৈরি হয়ে যায়, যাতে নিজের ভিতরকার ধর্মটি চাপা পড়ে থাকে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> প্রাণের ভিতরকার সৃজনশক্তিই হচ্ছে তার ধর্ম। জলের জলত্বই হচ্ছে জলের ধর্ম, আগুনের আগুনত্বই হচ্ছে আগুনের ধর্ম। তেমনি মানুষের ধর্মই হচ্ছে তার অন্তরতর সত্য (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০০ : ৩৯)।

রবীন্দ্রনাথ নিজেও চৈতন্যের ধর্মকে, আত্মার সত্যকেই পরম পূজনীয়, সত্য ও ধর্মজ্ঞান করতেন। 'স্বকীয়তা *[Originality]*, স্বভাব *[Nature]*, পরম্পরা *[Tradition]*– এই তিনকে ধরেই শিল্পের সাধনা (নন্দলাল, ১৩৫৭ : ৩৮)। শিল্পী তো স্বভাবের যথাযথ অনুকরণ করেন না। শিল্প বিষয়ে তিনি চিত্তের কল্পলোক আশ্রয় করেন তাঁর মূর্ত ভাবনার কেন্দ্র আর চিত্তের কল্পলোক গড়ে ওঠে পরম্পরার মাধ্যমে। শিল্পী রবীন্দ্রনাথও ছিলেন সমৃদ্ধ ঐতিহ্য বা পরম্পরার উত্তরসূরি। ঠাকুর পরিবারের আদি পুরুষ জগন্নাথ কুশারী পিরালি বংশের মেয়ে বিয়ে করে হয়েছিলেন সমাজচ্যুত ও স্থানান্তরিত। পরম্পরা-সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রচলিত ধর্মের মোহমুক্ত এবং অতীন্দ্রিয়ের সন্ধানী। উল্লেখ করা প্রয়োজন 'পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর-ই রবীন্দ্র অধ্যাত্মজগতে প্রবেশের দ্বার খুলেছেন (এষা, ২০০৯ : ৯৩)। রবীন্দ্রনাথ সেই অধ্যাত্মভূমিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত সত্য স্বরূপকে প্রথম উপলব্ধি করেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পবিত্র অন্তরাত্মার আলোকস্পর্শে। রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও ছিলেন মুক্ত মনের মানুষ; তিনি ঈশ্বর, প্রকৃতি ও মানব একেরই প্রকাশ বলে মনে করতেন। পিতার প্রভাবে তাঁর প্রথম নিবিড় সম্বন্ধ হয়েছিল প্রকৃতির সঙ্গে। 'তাঁর চেতনার আদি অদিতি হচ্ছে এই প্রকৃতি (আকতার, ২০১১ : ১০)। রবীন্দ্র অধ্যাত্মচেতনা উত্তরণের পথ পায় বড়দা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাদম্বরী দেবীর সান্নিধ্যে। তাঁদের সংস্পর্শে থাকার সময়ই কবির অধ্যাত্মচেতনার বা ঈশ্বর অনুভূতির এক পরম প্রকাশ ঘটে। কবিরভাষায়:

> দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্ব সংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে, বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেই দিনই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল। এমনি হইল, আমার কাছে তখন কেহই এবং কিছুই অপ্রিয় রহিল না (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৩ : ১৩৩)।

কবির অধ্যাত্মচেতনার মূল রূপটি ছিল আনন্দ; যা উপনিষদ থেকে প্রাপ্ত। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' রচনার মধ্য দিয়েই সেই রূপটি প্রথম প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ জগৎকে দেখেছেন 'আনন্দরূপমমৃত' রূপে। রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মচেতনার মূল রূপটি পরিস্ফুট হয়েছে তাঁর *প্রভাতসঙ্গীত* রচনার মধ্য দিয়ে। কবি নিজেও সেই প্রথম অধ্যাত্ম-উপলব্ধির কথা স্বীকার করেছেন :

> সকলেই যেন নিখিলসমুদ্রের উপর দিয়া তরঙ্গলীলার মতো বহিয়া চলিয়াছে। শিশুকাল হইতে কেবল চোখ দিয়া দেখাই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ যেন একেবারে সমস্ত চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৩ : ১৩৪)

রবীন্দ্রনাথ তাঁর *প্রভাতসঙ্গীত* থেকে *নৈবেদ্য* পর্যন্ত বিশ্ব নিসর্গের মধ্যে প্রাণের লীলা, প্রকৃতির মধ্যে সৌন্দর্য সন্ধান, অনুভবের পরমতা নানারূপে ফুটিয়ে তুলেছেন; যা তাঁকে এক ধরনের মৃত্যু অতিক্রমী শক্তিমত্তায় প্রত্যয়ী করে তোলে। তাই লক্ষ করা যায় *স্মরণ* কাব্যে কবি মৃত্যুর তোরণ অতিক্রম করে প্রকৃতির মানবাত্মাকে দেখেছেন লীলার সহযাত্রীরূপে। ফলে প্রকৃতিলীন কবিসত্তা নিজের অস্তিত্বের চৈতন্যে উপলব্ধি করেন এক মহাসত্তার সঙ্গে বিপুল বিচ্ছিন্নতা ও দূরত্বকে তীব্র করার আকাঙ্ক্ষা। এই মহাসত্তাই ঈশ্বর-পরমপ্রিয় প্রভুরূপে সম্বোধিত হয়। *ক্ষণিকার* পরেই কবি রচনা করেন *নৈবেদ্য*। এই কথাটির [*নৈবেদ্য*] মধ্যেই ভক্তির পূর্ণতা অনুভূত হয়। *নৈবেদ্য* কাব্যে সেই পরমপিতা ব্রহ্মেরই প্রকাশ।

চৈতালি কাব্য থেকে কবির মধ্যে জগৎ ও জীবনের রূপ-রস ও ভোগের আবেষ্টনীমুক্ত জীবনের আকাঙ্ক্ষা জাগে। '*কথা*'য় ভারতীয় পুরাণ-ইতিহাস ত্যাগ করে ভাব-কল্পনায় আবিষ্ট হন রবীন্দ্রনাথ। *নৈবেদ্যে* এসে কবি অধ্যাত্ম জীবনের উদার পরিবেশের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কবি *নৈবেদ্যে* তাঁর ঈশ্বর ও জীবনদেবতার নিকট সংগ্রামের উদ্দীপনা, প্রেরণা ও শক্তি প্রার্থনা করেছেন :

> দাও হস্তে তুলি
> নিজ হাতে তোমার অমোঘ শরগুলি,
> তোমার অক্ষয় তূণ। অস্ত্র দীক্ষা দেহো
> রণগুরু। [নৈবেদ্য/৪৭ সংখ্যক কবিতা]

খেয়া কাব্যে দেখি কবির ভগবদনুভূতির এক নতুন রূপ। এ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসংসার ও আত্মলোক অতিক্রম করে আত্মার মহাজাগতিকতায় প্রবেশ করতে চেয়েছেন। 'এ পর্বে রোমান্টিক কবির খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথ। *খেয়াতে*ই রবীন্দ্রনাথের মিস্টিক কবিতার আরম্ভ (উপেন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৪৮৩)। অসীম-অরূপ লীলাচ্ছলে নানাবেশে কবির চিত্তে স্পর্শ করে আর নানা স্পর্শে তাঁর হৃদয়ে নানা রসের উৎস খুলে যায়। অসীমকে সীমায়, অজানাকে জানায়, অধরাকে ধরায়, অরূপকে রূপের আভাসের মধ্যে প্রতিবিম্বিত করতে হলে কবিকে প্রধানত রূপক, সংকেত, ইঙ্গিত, প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। তাই রূপক ও সাংকেতিকতার সাহায্যে কবির নিগূঢ় আধ্যাত্মিক অনুভূতি বিভিন্নভাবে প্রকাশ পায়। এই কাব্যে কবি তাঁর জীবন-স্বামীর নিবিড় আলিঙ্গন কামনা করেন :

> আমি আপনাকে আজ বিছিয়ে দেব
> কিছুই না করি,
> দুহাত মেলে দিয়ে, তোমার
> চরণ পাকড়ি।
> [বর্ষাসন্ধ্যা/খেয়া]

কবি যখন সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে শ্রান্ত, ক্লান্ত, যখন বিষয়বাসনা, মান-সম্মান সকলই অর্থশূন্য, তখনই তিনি পরমপিতার প্রতি নৈবেদ্য সাজিয়েছেন, 'ভগবৎ-ভক্তিতে পূর্ণ হয়ে *নৈবেদ্য* যে শুধু সেই পরমব্রহ্মের প্রতি নিবেদন এখানে কোনো কিন্তু নেই (এষা, ২০০৯ : ১৮)। পৃথিবী ঈশ্বরে আচ্ছন্ন – মহর্ষির এই মূলমন্ত্রটি নব নব রূপে ব্যক্ত এই কাব্যে। এরপরেই কবির জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় *গীতাঞ্জলি* (১৯১০)। কবির রচিত উপদেশমালায় কবির ধর্মভাবনা, অধ্যাত্মবোধ, সৌন্দর্যবোধ, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্মবোধ, মানবপ্রেম, বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি প্রেম ও ঈশ্বরপ্রেম মিলেমিশে একাকার হয়ে তা সুর ও ছন্দে *গীতাঞ্জলি*-তে প্রকাশ পায়। ১৩১৩ সাল থেকে ১৩১৭ সালের ৩০ শ্রাবণ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যে কবিতা ও গানগুলো রচনা করেছেন তাই মূলত *গীতাঞ্জলি*। কখনও শিলাইদহের নদীবক্ষে, কখনও শান্তিনিকেতনের সূর্যস্নাত আকাশের তলায় রচিত হতে থাকে *গীতাঞ্জলি*র গানগুলো। ভক্তিসাগরে নিমজ্জিত কবি কখনও ডাকেন নিভৃত প্রাণের দেবতাকে, কখনও তাঁর আসনতলে চরণধুলায় লুটিয়ে পড়েন, কখনও বা সেই আলোর অন্বেষণ করেন যা প্রাণের প্রদীপটিকে রাখে জ্বালিয়ে।

গীতাঞ্জলি কাব্যের গানের সংখ্যা ১৫৭। এখান থেকে ৫০টি গানের ইংরেজি অনুবাদ এবং গীতিমাল্যসহ অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের গান ও কবিতার অনুবাদ করে ১৩১৯ সালের ১৪ জ্যৈষ্ঠ *গীতাঞ্জলি* নামে প্রকাশ করেন। *গীতাঞ্জলি*র ৫৬টি কবিতায় সুর দেওয়া হয়। এখানে বলা প্রয়োজন — 'ইংরেজি গীতাঞ্জলির মোট গান ও কবিতার ১৫৭টি গান ও কবিতার মধ্যে থেকে ১০৪টিকে বাদ দিয়ে মাত্র নেওয়া হয়েছে ৫৩টি। আর বাকি ৫০টির মধ্যে রয়েছে *গীতিমাল্য* থেকে ১৬টি, *নৈবেদ্য* থেকে ১৫টি, *খেয়া* থেকে ১১টি, *শিশু* থেকে ৩টি, *কল্পনা* থেকে ১টি, *স্মরণ* থেকে ১টি এবং *অচলায়তন* নাটক থেকে ১টি, *চৈতালি* থেকে ১টি, *উৎসর্গ* থেকে ১টি অর্থাৎ মোট ৯টি কাব্যগ্রন্থ থেকে ১০২টি গান ও কবিতা এবং *অচলায়তন* নাটক থেকে ১টি গানের অনুবাদ সংকলিত হয়েছে (আবদার, ১৯৯৩ : ১০)। ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ মে কবি বিলেত যাত্রা করেন। বিলেতে কবি ইয়েটস এবং বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিক অনূদিত কবিতা ও গানগুলোর ভূয়সী প্রশংসা করেন। 'ইংরেজি গীতাঞ্জলির *[Songs Offering]* গানগুলি কবি নির্বাচন করেছিলেন *নৈবেদ্য* থেকে *গীতিমাল্য* পর্যন্ত সমস্ত গানের শ্রেষ্ঠ ডালি থেকে (এষা, ২০০৯ : ১০৯)। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ নভেম্বর ইংরেজি অনুবাদকৃত শ্রেষ্ঠ গানগুলোর জন্যে কবিকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করে দেওয়া হয় বিশ্বসম্মান। *গীতাঞ্জলি* রবীন্দ্রনাথের প্রধান কাব্য কিংবা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কোনটিই নয়। তিনি তা দাবিও করেননি কিংবা কোন সমালোচক এ বিষয়ে তেমন কোন বিতর্ক উপস্থাপনও করেন নি। তবুও তিনি এই কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পান।

রবীন্দ্রনাথ যখন নোবেল পুরস্কার পান তখন ইউরোপের মানবতন্ত্রী এবং বিজ্ঞানতন্ত্রী সভ্যতা বিস্ফোরণের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল। এ জটিল সভ্যতার নিচের তলায় ছিল কুটিল ক্ষয় আর উপর তলায় ছিল কুৎসিত স্বার্থপরতা এবং শূন্যতা। এমন সময়ে এক

অপেক্ষাকৃত সরল অথচ গভীর সংস্কৃতির মর্মস্পর্শী বাণী রবীন্দ্রনাথ উপস্থাপন করলেন তাঁর *গীতাঞ্জলি* কাব্যে। সংশয়দীর্ণ ও হৃত-প্রত্যয় ইউরোপীয় চিত্ত তাঁর আনন্দিত উপলব্ধি ও গভীর বিশ্বাসে মুগ্ধ হয়েছিলেন। আর তাই কবি ইয়েটস্ এই *গীতাঞ্জলি* কাব্যের ভূমিকায় লিখেছিলেন :

> ভারতীয় সভ্যতার মতো রবীন্দ্রনাথ ও আত্মাকে আবিষ্কার করে এবং তার মুক্তির কাছে নিজেকে সমর্পণ করেই খুশি। সারা জীবন আমি যে জগতের স্বপ্ন দেখেছি এ কবিতাগুলোর চিন্তায় দেখতে পাই সেই জগৎ। (উদ্ধৃত, আনিসুজ্জামান, ১৩৭৫ : ২৯৮)

তবে এই স্বপ্নের জগৎ শুধু ইয়েটসের একার ছিল না। কেননা *গীতাঞ্জলি* ছিল তৎকালীন ব্রিটিশদের কাছে বৈশাখী দাবদাহে এক গ্লাস শীতল জলের মতো। তাই ইয়েটসের বন্ধু জর্জ রাসেল লিখেছিলেন :

> ভগবৎ গীতা এবং উপনিষদের প্রজ্ঞায় এমন দৈব পরিপূর্ণতা দেখতে পাই যাতে আমার মনে হয় এর রচয়িতা যেন অবিক্ষুব্ধ স্মৃতি নিয়ে কামনাতুর সহস্র জীবনের দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখেছেন, দেখেছেন কায়াহীনের সঙ্গে ছায়ার লোভে মানুষের জ্বরাক্রান্ত দ্বন্দ্ব। নইলে আত্মা যা নিশ্চয় বলে জানে তা এমন বিশ্বাসের সঙ্গে কি করে তাঁরা বলে যেতে পারলেন? (উদ্ধৃত, আনিসুজ্জামান, ১৩৭৫ : ২৯৮)

তবে যে ক্ষুব্ধ-বিক্ষুব্ধ মনে প্রশান্তির ছোঁয়া দেওয়ার জন্যই রবীন্দ্রনাথকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে এমন ধারণা একপেশে বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক কেননা এর পেছনে কাজ করেছিল একটি রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত। কারণ ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কর্মের বিবেচনা করলে দেখা যাবে — ১৯০৫-পরবর্তী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা ছিল তাঁর। এ সময়ে তিনি গান গেয়েছেন, প্রতিবাদ মিছিল, সমাবেশে সশরীরে যোগ দিয়েছেন। 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি'/সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে' বা 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' — এই সব অসামান্য দেশাত্মবোধক গান তিনি রচনা করেছেন। গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন। দেশের সংকটময় পরিস্থিতিতে কবির চিত্ত ব্যথিত হয়েছে গভীরভাবে; এবং সে বেদনা প্রকাশও করেছেন। এক আলোচনায় হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়দের বলেছিলেন :

> দেখো, তোমরা কমিউনিস্টরা ভুল করো না, যুদ্ধের চাপে ইংরেজ যাই বলুক, তাকে বিশ্বাস করো না। সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বাসঘাতকতা করবেই। (হীরেন্দ্রনাথ, ১৯৯৩ : ৩৫)

কিন্তু এর পরেই ধীরে ধীরে প্রত্যক্ষ আন্দোলনের পথ থেকে সরে দাঁড়ান রবীন্দ্রনাথ। জনারণ্য থেকে নিজেকে অপসারিত করেন তিনি। আপন শ্রেয়-ভাবনায় নিজের চিত্তকে করেছেন নিমগ্ন। তাই ১৮৯০-১৯১০ কালপর্বে গ্রাম বাংলার পল্লি-প্রকৃতি এবং গণমানুষের যে সংস্পর্শ তিনি লাভ করেছেন তা আর অবশিষ্ট জীবনে কখনো সম্ভব

হয়নি। সাধারণ মানুষের কথা তাঁর মতো করে বলতে পারেননি বলে নিজেই আর্তনাদ করেছেন। এ পর্বে রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠতে পারতেন গণ-মানুষের রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু '*গীতাঞ্জলি*তে একটা ভাবের ঘোর কবিকে পেয়ে বসেছিল (সনৎকুমার, ২০১১ : ২১)। এই ভাবের ঘোরই কবিকে করেছিল গণমানুষ-ছিন্ন। এই বিশেষ ভাব কবিকে এনে দিয়েছিল বিশ্ব সম্মান। 'কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, পশ্চিমা জগতের প্রশান্তিই প্রয়োজন যুগিয়েছে রবীন্দ্র-আকর্ষণের (মনিরুজ্জামান, ২০১১ : ৯৯)। বিশেষত, *গীতাঞ্জলি* পর্বের ও তৎকালীন দৈশিক-বৈশ্বিক বাস্তবতায়। তবে সমগ্র সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ কারো প্রয়োজন মেটাননি। প্রয়োজন তৈরি করেছেন শিল্পের-সাহিত্যের-দর্শনের-জগতের তথা জীবনের জীবনকে নতুন রূপে উপস্থাপন করেছেন প্রাণিজীবনের সামনে। নবজীবনের নামই রবীন্দ্র-জীবন।

রবীন্দ্রনাথ *গীতাঞ্জলি*র মধ্য দিয়ে যে নব জীবনের সন্ধান দেন, সেখানে তিনি নিজেই নব-নবরূপে তাঁর সখা, প্রভু, বন্ধু, প্রিয়তমাকে বিচিত্রভাবে পাবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন। কেননা — 'গীতাঞ্জলিতে একাধিক ভাবের কবিতা বা গান আছে। তার মধ্যে প্রধান ভাব যেটা সেটা হলো — আত্মনিবেদনের ভাব, ঈশ্বরের সঙ্গে একটা সহজ আমি–তুমির অন্তরঙ্গতা, তার সুরটা অন্তর্মুখী সাধনার সুর–ধর্মীয় নিঃসন্দেহে কিন্তু সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক। নানা সম্প্রদায়ের ভাবনা ও সাধনার ধারা তার মধ্যে এসেছে মিশেছে (সত্যেন্দ্রনাথ, ১৩৫৭ : ৭১)। তাই *গীতাঞ্জলি*তে পাঁচটি ভাবধারার কবিতা লক্ষ করা যায় :

এক. ভগবানকে সহজে না পাবার জন্য হতাশার ভাব ও প্রবল বিরহ বেদনার অনুভূতি।

দুই. অহংকার ত্যাগ করে দুঃখ-বেদনার দাহে হৃদয়কে নির্মল করে ভগবদুপলব্ধির উপযোগী করা।

তিন. প্রকৃতি ও মানবের বিচিত্র রূপ-রসে ভগবানের আভাস ও ক্ষণস্পর্শের অনুভূতি।

চার. দীন-দরিদ্রের মধ্যে হীন অস্পৃশ্যদের মধ্যে পতিতপাবন ভগবানের অবস্থান।

পাঁচ. অসীম-সসীমের লীলাতত্ত্বের অনুভূতি। ব্যক্তিসত্তা অধিসত্তায় বিলীন হওয়া।

প্রথম ধারায় খেয়া হতে কবি ভগবানকে একান্ত করে পাবার জন্য আকুল আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এই আকাঙ্ক্ষা প্রবল বিরহ-বেদনার মধ্যে রূপান্তরিত হয়েছে। বিরহের কবিতাগুলো কাব্যরসে সমৃদ্ধ। কয়েকটি কবিতা বৈষ্ণব পদাবলি ও *মেঘদূতে*র ঐতিহ্যে রঞ্জিত। বর্ষায় যে অকারণ বিরহ-বেদনা আমাদের চিত্তকে উতলা করে, তার পটভূমিতেই কবির ভগবত-বিরহ-বেদনা উৎসারিত হয়েছে :

তুমি যদি না দেখা দাও,
কর আমায় হেলা,

কেমন করে কাটে আমার
এমন বাদল-বেলা। [১৬ সংখ্যক কবিতা]

আবার কখনও গভীর রাতে ব্যাকুল চেতনায় কবির চিত্ত অধীর হয়েছে :

নয়নে ঘুম নিল কেড়ে,
উঠে বসি শয়ন ছেড়ে
মেলে আঁখি চেয়ে থাকি
পাই নে দেখা তার। [৬০ সংখ্যক কবিতা]

আবার কখনো কবি তাঁর নিজের বিরহকে বিশ্ব চরাচরে পরিব্যাপ্ত করে দেখেছেন :

সকল জীবন উদাস করিয়া
কত গানে সুর গলিয়া ঝরিয়া
তোমারি বিরহ উঠিছে ভরিয়া
আমার হিয়ার মাঝে হে। [২৫ সংখ্যক কবিতা]

দ্বিতীয় ধারায় কবি বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবসমাজের সর্বত্র বিশ্ববিধাতা ভগবানের লীলা অনুভব করেন, বিশ্বচরাচরে ছোট-বড় সকলের মধ্যে পরমদেবতার গান শুনতে পান। একদিকে কবির আত্মনিবেদন, অন্যদিকে তেমনি আছে বেদনাবোধ। এই ভাবাদর্শে 'উপনিষদ নিশ্চয় আছে, কিন্তু তা আরো দুটি উপাদানের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে, সে দুটি হল বৈষ্ণবীয় ভক্তিবাদ ও মিস্টিসিজ্‌ম, শেষোক্তটির মধ্যে সন্তসাধক ও আউল বাউলদের ধর্মদর্শন (গুণময়, ১৯৯৩ : ১৭)। তাই প্রকৃতির সর্বত্র তিনি আত্মনিবেদন করেন যেমন, তেমনি বিরহবোধ দ্বারা তাড়িত হন।

গীতাঞ্জলিতে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মচেতনার মূলতত্ত্ব হলো—পূর্ণের সঙ্গে মিলন, ব্যক্তিসত্তার মধ্যে অধিসত্তার অনুভব, কখনও অধিসত্তাকে ব্যক্তিসত্তায় রূপান্তর, কখনও বা ব্যক্তিসত্তা অধিসত্তায় বিলীন হওয়া। মিলনে ব্যক্তির সত্তার সঙ্গে স্রষ্টার মিলনের প্রধান বাধা হল অহংকার। কারণ অহংকারে বিশ্ব প্রতিহত, আনন্দ সংকীর্ণ ও প্রেম সঙ্কুচিত হয়। অহংকার, আত্মপ্রচার ও স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে দুঃখের আগুনে পুড়ে মনকে প্রস্তুত করেছেন, পরিপূর্ণ ভগবদুপলব্ধির উপযোগী করেছেন :

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণধুলার তলে।
সকল অহংকার হে আমার সকল
ডুবাও চোখের জলে। [১ সংখ্যক কবিতা]

ভগবদুপলব্ধির পথে, সীমার মধ্যে অসীমের লীলা উপলব্ধির পথে বাধা-বিঘ্ন দূর করে কবির মনে ভগবানের আভাস বা স্পর্শ লাভের মধ্যে আনন্দানুভূতি জাগে :

এই চিত্ত আমার বৃন্ত কেবল
তারি 'পরে বিশ্বকমল;
তারি 'পরে পূর্ণ প্রকাশ
দেখাও মোরে। [৮৫ সংখ্যক কবিতা]

গীতাঞ্জলির তৃতীয় ধারায় কবি তাঁর পরম দয়িতের যে ইঙ্গিত-ব্যঞ্জনা, যে ক্ষণস্পর্শ পেয়েছেন, প্রকৃতির বিচিত্র রূপের মধ্যে যে আভাস তার আলোছায়ায় লুকোচুরির মধ্যে, তাতে কবির চিত্ত উতলা হয়ে যায়। শরৎ-প্রকৃতিতে, বর্ষার বাদলে, বসন্তের দখিন সমীরণে কবি তাঁর প্রিয়তমের আভাস পান। কবি শরতের শিশির ভেজা, শিউলি-ঝরা, আলোছায়ায় মায়াময়, লঘু শুভ মায়ার মধ্যে প্রিয়তমের আগমন প্রত্যক্ষ করেন :

আমার-নয়ন ভুলানো এলে
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে।
শিউলিতলায় পাশে পাশে
ঝরা ফুলের রাশে রাশে
শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে
অরুণ-রাঙা-চরণ ফেলে
নয়ন-ভুলানো এলে। [১৩ সংখ্যক কবিতা]

জ্যোৎস্না-প্লাবিত বসন্ত যামিনীতে কবি তাঁর প্রিয়তমের স্পর্শ পেয়ে পুলকে রোমাঞ্চিত হয়েছেন :

নব পল্লব মর্মর ছন্দে,
চন্দ্র-কিরণ-সুধা-সিঞ্চিত অম্বরে
অশ্রু-সরম মহানন্দে
আমি পুলকিত কার পরশনে
গন্ধবিধুর সমীরণে। [৫৪ সংখ্যক কবিতা]

কবি প্রভাতে তন্দ্রালস শয্যায়, গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন রাত্রিতে মিলনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন এবং তা নষ্ট হওয়ায় অনুতপ্ত হয়েছেন। কিন্তু কখনও পরম দয়িতের ক্ষণস্পর্শে কবির হৃদয় আনন্দে ভরপুর, অসীম আনন্দে ধরণী উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সার্থক হয়ে ওঠে জীবন :

সকল আকাশ সকল ধরা
আনন্দ হাসিতে ভরা,
যে দিক-পানে নয়নে মেলি
ভালো সবই ভালো। [৪৫ সংখ্যক কবিতা]

চতুর্থ ধারায় রবীন্দ্রনাথের ভগবত সাধনা সংসার বিরাগী কোন তপস্বীর সাধনা নয়। তিনি সংসারের সর্বত্র দেবতাকে অনুভব করেন। দেবতা কোন বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের নিজস্ব সম্পত্তি নয়, মানুষ রচিত সমাজের সর্বত্র তাঁর অবস্থান। মানুষের-স্বদেশের-সমাজের মধ্যেই কবি দেবতাকে খুঁজেছেন। কারণ রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মচেতনা দেশ-কাল সংশ্লিষ্ট :

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হতে হবে তাদের সবার সমান। [১০৮ সংখ্যক কবিতা]

*গীতাঞ্জলি*তে কবি এই সর্বমানবের ভগবানকে চেয়েছেন। সকলের সঙ্গে তাঁর প্রেম লাভ করে তিনি ধন্য হতে চান :

সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়,
সেথায় আপন আমারো।
সবার পানে যেথায় বাহু পসারো,
সেই খানেতেই প্রেম জাগিবে আমারো। [৯৪ সংখ্যক কবিতা]

পঞ্চম ধারায় রবীন্দ্রনাথ মানুষের সঙ্গে ভগবানের প্রেমলীলার সন্ধান করেছেন। মানুষের সঙ্গে ভগবানের প্রেমলীলা চলেছে অনাদিকাল হতে। জন্মজন্মান্তরব্যাপী সৃষ্টির মানব ও প্রকৃতির-সৌন্দর্য-মাধুর্য-প্রেমের মধ্য দিয়ে ভগবান ও মানুষের অনন্ত মিলন অভিসারের পালা রচিত হয়েছে। কবি জন্মে জন্মে তাঁর প্রিয়তমের কতো রূপ দেখেছেন, কতো অমৃত রস আস্বাদন করেছেন :

কত সুখে দুখে কত প্রেমে গানে
অমৃতের কত রসবরষণ। [২১ সংখ্যক কবিতা]

মানুষকে, সৃষ্টিকে ভগবানের একান্ত প্রয়োজন। তার মধ্য দিয়েই ভগবান তাঁর আত্মোপলব্ধি করেছেন, আত্মদর্শন করেছেন। আত্মরস আস্বাদন করেছেন। কারণ মানুষ তাঁর সত্তায় ভগবানের অস্তিত্ব কল্পনা করে বলেই ভগবান বিরাজমান। 'আমার চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ।' ভগবানের এই সত্তা-ই ভগবানরূপে বিরাজমান *গীতাঞ্জলি*তেও :

আমার নইলে ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হত যে মিছে।
আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা,
আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা,
মোর জীবনে বিচিত্ররূপ ধরে
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে। [১২১ সংখ্যক কবিতা]

কবির অসীম বিস্ময় যে তাঁর মধ্যেই ভগবানের আত্মোপলব্ধি। মানবের সীমাবদ্ধ জীবনের বহুমাত্রিক রূপে দেবতার লীলায় তা হয়ে ওঠে বিচিত্র। মানবজীবনের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের প্রয়োজন নাই—পরম ব্রহ্মার প্রেমলীলার বাহন রূপেই তার যথার্থ সার্থকতা। এটাই মানবজীবনের চরম ও পরম উদ্দেশ্য বলে কবি মনে করেছেন :

আমার মাঝে তোমার লীলা হবে,
তাই তো আমি এসেছি এই ভবে।
এই ঘরে সব খুলে যাবে দ্বার,
ঘুচে যাবে সকল অহংকার,
আনন্দময় তোমার এ সংসারে
আমার কিছু আর বাকি না রবে।
মরে গিয়ে বাঁচব আমি তবে,
আমার মাঝে তোমার লীলা হবে। [১৩০ সংখ্যক কবিতা]

গীতাঞ্জলি কাব্যে অধ্যাত্মচেতনার একটি দিক হল অস্তিত্ব বিরহ। 'তোমার মাঝে আমার আপনারে'—দেখার সাধনাই রবীন্দ্র চিত্তে আপনার ধ্যানরূপ সম্পূর্ণ হতে দেবার সাধনা। মানুষ ও ঈশ্বরের অন্তরঙ্গতার স্বরূপ সন্ধান করাই অস্তিত্বচেতনা। অস্তিত্ববাদী দর্শনের আদি পুরুষ কিয়েৰ্কেগার্ডের দার্শনিক ব্যাখ্যা *গীতাঞ্জলি*। তিনি বলেছিলেন, মানুষ দুঃখে-তাপে-নৈরাশ্যে ঝাঁপ দেয় অধ্যাত্মলোকে, বিশ্বাসের জগতে। এই মতাদর্শের পূর্ণ প্রকাশ দেখা যায় *গীতাঞ্জলিতেই*। তবে এর প্রথম রূপায়ণ *নৈবেদ্যে*। কবিসত্তাকে ধ্যানে পূর্ণ হতে দেখা যায় *গীতাঞ্জলিতে*। মানুষের তিনটি অস্তিত্ব স্তর—নান্দনিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক। এর মধ্যে আধ্যাত্মিক স্তরই শ্রেষ্ঠ। *গীতাঞ্জলি* কাব্যের ঈশ্বর ও অধ্যাত্মচেতনার পরবর্তী ধাপে ঈশ্বর নিরপেক্ষ এবং সার্বভৌম স্বয়ংসম্পূর্ণ অস্তিত্বচিন্তা বিশেষভাবে দখল করে আছে রবীন্দ্রমননে। তাই আবু সয়ীদ আইয়ুব বলেন :

> *গীতাঞ্জলি* পড়বার সময়ে সবিস্ময়ে অনুভব করি আমরা যেন দুই জগতের মধ্যবর্তী সীমান্তরেখা ধরে হাঁটছি। একটু এদিকে সরলে পা পড়ে মর্ত্যলোকের মাটিতে, একটু ওদিক সরলে বাতাসে পাই অমৃতলোকের গন্ধ (আবু সয়ীদ, ১৯৬৮ : ৭৭)।

গীতাঞ্জলি কাব্যে রবীন্দ্রনাথ অস্তিত্বদর্শনের লক্ষ্যে মিস্টিসিজম বা মরমীয় পথ ধরে হেঁটেছেন। তাঁর সাধনা ছিল, অস্তিত্বকে লীন করে শূন্যতায় উত্তীর্ণ হওয়া। এই লীনতার তাৎপর্য রবীন্দ্রনাথে একান্তই কাব্যিক যেখানে তা অস্তিত্বকে সমর্পণের রূপকল্প আশ্রয় করে :

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণধুলার তলে।

সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে। [১ সংখ্যক কবিতা]

কবি চোখের জলে অহংকার-যুক্ত 'আমি' ডুবিয়ে অহংকার-মুক্ত করতে চান। *গীতাঞ্জলি* আত্মপ্রকাশের কাব্য। কিন্তু প্রকাশ 'আমি'র আত্মপ্রকাশকে নিঃশেষ করে যে মুক্ত-সত্তায় উত্তীর্ণ হতে চেয়েছে কবি তাকে 'তুমি' নাম দেন। তাই রণজিৎ গুহ মনে করেন :

> কোথাও ভক্তির পাত্র, আর ভক্ত আমি। কোথাও বা ঠিক উলটো। যেখানে দাস সম্বন্ধের দূরত্ব প্রায় অসম্ভব বলেই মনে হয়। গীতাঞ্জলির প্রত্যেকটি কবিতাই আত্মকথা। ভাবের ঘোরে তাদের নায়ক যে আমি ও তার অপর যে তুমি তারা বারেবারেই একে অন্যের ভূমিকায় অনুবাদের নাটক জমাচ্ছে (রণজিৎ, ২০১০ : ৯২)।

তাই আমি 'আমি' 'তুমি'র দ্বৈত-সত্তা বিশেষ কোনো রূপ নয়। 'বিরহ দর্শনই কবির অস্তিত্বদর্শন। তাই তিনি গীতাঞ্জলি কাব্যে বিরহকে চিরসত্যের মর্যাদা দিয়েছেন (জগন্নাথ, ১৯৮৮ : ৩৯)। শূন্যতা আছে বলে ভূমাত্ব আছে, চিরন্তন সঙ্গী এবং নিরবধি চিহ্ন বা উপাধি *গীতাঞ্জলি*র কবির এই বিরহ প্রকাশ বহুমাত্রিক। একজন সমালোচক এটাকে অকপটে স্বীকারও করেছেন :

> গীতাঞ্জলি'তে দেখিতেছি এই উন্মুখ অধীর প্রতীক্ষা বিরহের ক্রন্দনে গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতেছে। বিরহের বেদনা, দেবতাকে একান্ত না পাওয়ার দুঃখ 'গীতাঞ্জলি'র গানগুলির উপর সুগভীর ছায়াপাত করিয়াছে (নীহাররঞ্জন, ১৩৪৮ : ১১০)।

*গীতাঞ্জলি*র বিরহ কবির সংবেদনশীল সত্তায় ছায়াপাত করেছে। এই বিরহ পাওয়া-না-পাওয়ার দ্বৈরথ। দেবতাকে পরম জ্ঞান করা কিংবা নিজেকে লীন করার মধ্যেই এই বিরহ। এই বিরহ অস্তিত্বের বিরহ। সত্তার বিরহ। এই বিরহ সত্তায়ই একাকার হয়েছে কবির অধ্যাত্মচেতনা। এই অধ্যাত্মচেতনা ও বিরহ দুটিই নৈসর্গিক।

রবীন্দ্রনাথ ভাষার লক্ষণকে প্রতীকের দ্যোতনা হিসেবে বিবেচনা করেছেন। মানুষের কল্পনা, বাসনা, অন্তরের প্রেরণা ইত্যাদি প্রকৃতি জগৎ ও মানব জগৎ বিষয়ক অভিজ্ঞতা-উপাদানের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যক্ষের পশ্চাতে অপ্রত্যক্ষ রূপের পশ্চাতে অরূপ, শ্রেয় ও প্রেয়সত্তার অন্বেষণ ইত্যাদি ভাব সাধনা প্রকাশিত হয়েছে কবির স্বকীয় ও সামূহিক স্মৃতিপুঞ্জ থেকে আহৃত রূপক-প্রতীকের সাহায্যে। তাই *গীতাঞ্জলি*র ১৫৭টি কবিতা ও গানে রূপক বা রূপকাশ্রিত শব্দ, প্রতীক ও প্রতীকী ব্যঞ্জনামণ্ডিত শব্দ অজস্র উপাদানে বিগঠিত।

উপমেয়কে সম্পূর্ণ অস্বীকার না করে যদি তার ওপর উপমানের অভেদারোপ কল্পনা করা হয় তবে অলংকারটি হয় রূপক। উৎসগত দিক থেকে *গীতাঞ্জলি*র রূপকগুলো নৈসর্গিক উপাদান থেকে যেমন এসেছে, তেমনি অন্তর্লৌকিক জগৎ থেকেও এসেছে। উৎসগত দিকবিচারে রূপকগুলোতে উপনিষদ, বৈষ্ণব, বাউল, সুফিবাদীয় ভাবধারার

মিশ্রণে সম্মিলিত বোধ এবং রবীন্দ্র মননের প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা প্রযুক্ত হয়েছে। গঠনগত দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ জাগতিক ইন্দ্রিয়জাত মূর্ত উপাদানের সঙ্গে ইন্দ্রিয়াতীত বিমূর্ত উপাদানের সংমিশ্রণে রূপকের সৃষ্টি করেছেন।

গীতাঞ্জলির প্রতীকে এক বিশেষ 'আমি' সত্তা আছে যা শৈল্পিক তাৎপর্যে বিগঠিত। শিল্পীর প্রকাশের সব থেকে প্রধান মাধ্যম তিনি নিজে। সব প্রতীকের কেন্দ্রে আছে প্রকাশানন্দে উন্মুখী 'আমি' কেন্দ্রটি। 'আমি'-ই ধারণ করে আছে *গীতাঞ্জলির* অরূপ সত্তাকে এবং অন্তর্লোককেও। এর ফলে রবীন্দ্রনাথ *গীতাঞ্জলিতে* আত্মসামগ্র্য-এর প্রতিষ্ঠাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। *গীতাঞ্জলির* এই 'আমি' প্রতীকই ঐ 'তুমি' সত্তার উৎসারক ও প্রতীতির ধারক-বাহক।

গীতাঞ্জলিতে অরূপ সন্ধিৎসায় মগ্নকবি ভক্ত হয়ে তাঁর অরূপের কাছে অহংমুক্ত 'আমি' কে নিবেদন করেছেন। *গীতিমাল্যতে* এসে কবি অরূপের সন্ধান পেয়ে অরূপের গলায় গানের বরণমালা পরিয়েছেন। আর অরূপের সঙ্গে মহামিলনে কল্পনামগ্ন কবিকে সত্যজগতের যুদ্ধপীড়িত বিশ্বমানবের টানে ফিরিয়ে আনে *গীতালি* কাব্যে। এভাবে কবির মানসচৈতন্যে অধ্যাত্মচেতনার স্বরূপটি কোথাও মানস-সুন্দরী, কোথাও জীবনদেবতা, কোথাও সখা বা কোথাও প্রিয়জন। অর্থাৎ স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিক্ষম প্রজ্ঞার আত্মশক্তি হলো তাঁর অধ্যাত্মচেতনা। যা কবিতা ও গানের অন্তর্বয়নে রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে করেছে চিরন্তন, সর্বজনীন অথচ প্রাতিস্বিক।

রবীন্দ্র-চেতনার মর্মমূলে প্রোথিত রোমান্টিকতার অদিতি হলো নিসর্গচেতনা। নৈসর্গিক উপলব্ধিতে বিশেষ অস্তিত্বের উপলব্ধিই আধ্যাত্মিকতা। *গীতাঞ্জলি* কাব্যে কবি রবীন্দ্রনাথ আপাদ-মস্তক রোমান্টিক ও আধ্যাত্মিক। *গীতাঞ্জলি* তাই একাধারে অধ্যাত্মগভীরতা, রোমান্টিকতা ও উপনিষদের সঙ্গীতাত্মক শিল্পিতরূপ।

গ্রন্থপঞ্জি

আনিসুজ্জামান [সম্পা.] (১৩৭৫)। *রবীন্দ্রনাথ*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা

আবদার রশীদ (১৯৯৩)। *নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত গীতাঞ্জলি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

আবু সয়ীদ আইয়ুব (১৯৬৮)। *আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (১৪০৬)। *রবীন্দ্র কাব্য পরিক্রমা*, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, কলকাতা

এষা মিত্র (২০০৯)। *রবীন্দ্রসঙ্গীতে অধ্যাত্মচেতনা*, প্রতিভাষ, কলকাতা

গুণময় মান্না (১৯৯৩)। *রবীন্দ্র রচনার দর্শনভূমি*, প্যাপিরাস, কলকাতা

জগন্নাথ চক্রবর্তী (১৯৮৮)। *গীতাঞ্জলি অস্তিত্ব-বিরহ*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

নন্দলাল বসু (১৩৫৭)। *শিল্পকথা*, বিশ্বভারতী, কলকাতা

নীহাররঞ্জন রায় (১৩৪৮)। *রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা*, নিজ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা

বেগম আকতার কামাল (২০১১)। *রবীন্দ্রনাথের আত্মপরিচয়; স্বরূপ দর্শনের শিল্পভাষ্য*, কবি আবদুল গফ্‌ফার দত্ত চৌধুরী স্মারক-বক্তৃতা, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

মনিরুজ্জামান (২০১১)। *রবীন্দ্রচিন্তা*, শব্দচাষ প্রকাশনী, চট্টগ্রাম

রণজিৎ গুহ (২০১০)। *কবির নাম ও সর্বনাম*, তালপাতা, কলকাতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪০০), *আত্মপরিচয়*, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিতান, কলকাতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০০৩), *জীবনস্মৃতি*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস [সম্পা.] (১৯৯৫)। *সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

সত্যেন্দ্রনাথ রায় (১৩৫৭)। *রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগৎ*, গ্রন্থালয়, কলকাতা

সনৎকুমার সাহা (২০১১), *কবিতা-অকবিতা রবীন্দ্রনাথ*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা

সৈয়দ আকরম হোসেন (২০০১)। *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চেতনালোক ও শিল্পরূপ*, একুশে পাবলিকেশন, ঢাকা

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৯৯৩)। *সার্বভৌম কবি ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, কলকাতা